Islami Ain O Bichar
Vol. 16, Issue: 61
January-March, 2020

টেকসই উন্নয়নের জন্য সুশাসন : ইসলামী নির্দেশনা
Good Governance for Sustainable Development Islamic Guideline

Md. Ferdos Islam*

ABSTRACT

Although the concept of 'good governance' is a recent terminology, long before had religious books shed light on this topic. Good governance is seen as a 'system of governance' in political use. Many Prophets and Messengers have governed the affairs of the people as a part of their Prophethood and in the course of their governing the Administration, they had maintained certain ruling ideals, prnciples and characteristics and emphasized them to be strictly followed. From islamic standpoint, these prophetic guiduing prnciples may be termed as good governance system. Good governance is the only essential governing system that may ensure a sustainable society. From the last decade of the twentieth century, global donor agencies, including the United Nations, have been working to implement various strategies emphasizing good governance in developing countries. In this article, Western good governance terminology has been discussed in detail by presenting its elements and characteristics and the reasons for failure of the traditional good governance theory. Finally, this narration based article discusses the ways of establishing good governance with simplifying, universalizing and sustaining approaches through the discussion of the characteristics of Islamic governance and its application in the light of the Holy Qurān and Sunnah. The article argues that for building the desired society up, moral values are a must which would be realized by an education system inspired by religious pedagogy. Having such essential qualities, an administrative body may reduce the crisis of good governance and implement strategic policies of anti-corruption systems. Above all, this paper has been presented as a mate to the sacred dream of building an equitable society through the achievement of the true Islamic good governance and its features.

Keywords: good governance; morality; values; accountability; sustainable development.

সারসংক্ষেপ

'সুশাসন' প্রত্যয়টি হাল আমলের হলেও ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে বহু আগেই। সুশাসনকে রাজনৈতিক ব্যবহারে 'শাসন ব্যবস্থা' হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। অনেক নবি ও রাসুল তাঁদের নবুওয়াতের অংশ হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন এবং এই পরিচালনা করতে গিয়ে তাঁরা যে আদর্শ, বৈশিষ্ট্য এবং নিয়মাবলির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন, বর্তমানে আমরা সেগুলোকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সুশাসন ব্যবস্থা বলতে পারি। টেকসই সমাজ বিনির্মাণে সুশাসন একমাত্র অপরিহার্য শাসন ব্যবস্থা। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে জাতিসংঘসহ বৈশ্বিক দাতা সংস্থাগুলো উন্নয়নশীল দেশে সুশাসনের ওপর গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন কৌশলপত্র বাস্তবায়নে কাজ করছে। এ প্রবন্ধে পশ্চিমা সুশাসন তত্ত্ব আলোচনাপূর্বক তার উপাদান ও বৈশিষ্ট্যসমূহ উপস্থাপন এবং প্রচলিত 'সুশাসন' প্রত্যয়ের ব্যর্থতার কারণ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। বর্ণনা পদ্ধতিতে রচিত এ প্রবন্ধে কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে ইসলামী সুশাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা ও তার প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সরলীকরণ, সর্বজনীন এবং টেকসইকরণের পন্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ধর্মীয় শিক্ষা ও তাকওয়াকে অপরিহার্য ভেবে এ গুণাবলি অর্জনেরমাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সমাজ বিনির্মাণ, সুশাসনের সংকট নিরসন এবং দুর্নীতি-প্রতিরোধ ব্যবস্থাসমূহের কৌশলপূর্ণ বাস্তবায়ন এবং এ বাস্তবায়নে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন সহজীকরণ করা হয়েছে। সর্বোপরি প্রকৃত ইসলামী সুশাসন ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহের পূর্ণ প্রয়োগ-লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার পবিত্র স্বপ্নপূরণে সহায়ক হিসেবে এ প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে।

মূলশব্দ: সুশাসন; নৈতিকতা; মূল্যবোধ; জবাবদিহিতা; টেকসই উন্নয়ন।

* Md. Ferdos Islam is an M.Phil Research Fellow in the Dept. of Al-Quran and Islamic Studies, Islamic University, Kushtia, Bangladesh. email: aisferdous@gmail.com

ভূমিকা

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে গৌরবগাথা বিজয় অর্জন করেছে বাংলাদেশ। ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে বেশ কিছুকাল স্বৈরশাসনের অধীন থেকে নব্বইয়ের দশকে অনুন্নয়নশীল বাংলাদেশের উন্নয়ন শুরু হয়। এর পর থেকে উন্নয়ন হয়েছে মূলত জ্যামিতিক হারে। অর্থনীতি ও আর্থ-সামাজিক সূচকগুলোর প্রায় সবকটিতেই বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গিয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে। বর্তমানে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ বাংলাদেশ। উন্নয়নশীল বাংলাদেশের এখন স্বপ্ন হলো ২০২১ সালের ভেতরে মধ্যম আয়ের দেশে জায়গা করে নেওয়া। "আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) নিরিখে বিশ্বের ২৬তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান যেখানে ৪২তম।" (Momen 2019, 12)

সামগ্রিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের বেশ সাফল্য থাকলেও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির অভাবে অর্থনীতির টেকসই সাফল্যে পিছিয়ে পড়ছে বলে একমত অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা। প্রায় সকল গোলটেবিল আলোচনাতেই এর অন্তরায় হিসেবে তারা বলছেন সুশাসনের সমস্যার কথা।

জন্মলগ্ন থেকেই সাংঘর্ষিক রাজনীতির প্রবণতা বাংলাদেশকে বেশ পিছিয়েছে। আমাদের দেশে সুশাসনের সমস্যাটা যে গভীর, তা এখন সাধারণ মানুষও অনুধাবন করতে পারছেন। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে গত প্রায় পাঁচ দশকের উন্নয়ন আরও কয়েক গুণ ত্বরান্বিত হতো। সুশাসনের সর্বজনীন প্রায় সবগুলো সূচকে বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকা আমাদেরকে পীড়া দেয়।

> "এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের চেয়েও বাংলাদেশের সুশাসন-পরিস্থিতি নেতিবাচক। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, নিয়মবিধির প্রতিপালন ও আইনের শাসন- এই সূচকসমূহে বাংলাদেশ এই গ্রুপের সবার নিচে। সরকারের কার্যকরতার প্রশ্নে বাংলাদেশ নেপালের চেয়ে সামান্য ওপরে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রশ্নে বাংলাদেশ শুধু তার দুই প্রতিবেশী নেপাল ও পাকিস্তানের চেয়ে সামান্য এগিয়ে।" (Ferdous 2016, 10)

এসব তথ্য আমাদের জন্য হতাশাব্যঞ্জক। আশ্চর্যের বিষয় হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমাদের নীতি-নির্ধারকগণ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, আইন-প্রণেতা এমনকি দেশের আম-জনতা সকলেই একমত। সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সর্বমহলের কাছে অনস্বীকার্য ও নিয়ত আলোচ্য বিষয়। আমাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং আমাদের গবেষণা সংস্থাগুলো কর্তৃক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সেমিনার আয়োজন, গোলটেবিল আলোচনা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখন ও রিপোর্ট প্রকাশ করা হচ্ছে। এসব প্রকাশনাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়সমূহ উত্তরণের বিভিন্ন দিক উন্মোচন ও বর্ণনা করা হলেও কার্যকর ও টেকসই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ধর্মীয় শিক্ষার ওপর কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে না।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রধান উৎস হলো ধর্ম। ধর্মই আমাদের কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ- সে শিক্ষা দেয়। দেশ, জাতি ও সভ্যতার তারতম্যের কারণে সংস্কৃতি ভিন্ন হলেও পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলোর মৌলিক শিক্ষা এক ও অভিন্ন। এমতাবস্থায়, ধর্মীয় শিক্ষাকে উপেক্ষা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নামসর্বস্ব নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কথা বলা হলে প্রকৃত টেকসই উন্নয়ন আরাধ্যই থেকে যাবে।

সাধারণ সকল তত্ত্ব ও তথ্যকে সমন্বয় করে এ প্রবন্ধে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কুরআন-সুন্নাহ তথা ধর্মীয় শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে সুশাসনকে কেবল রাজনৈতিক অভিধা হিসেবে বিবেচনা না করে মানবজীবনের সার্বিক কল্যাণ ও নৈতিকতার প্রতিশব্দ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

মানবজীবনের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত গুণাবলিকে ইসলামী সুশাসনের স্বরূপ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ধর্ম ও নৈতিকতাহীন প্রচলিত সুশাসনের ব্যর্থতা ও তা থেকে উত্তরণের উপায় বের করাই এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

সুশাসন পরিচিতি

'সুশাসন' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Good Governance। অক্সফোর্ড লার্নারস ডিকশনারিতে Governance এর অর্থ দেওয়া হয়েছে-

> the activity of governing a country or controlling a company or an organization; the way in which a country is governed or a company or institution is controlled| (OLD 2020, *governance*)

এর সমার্থক হিসেবে ইংরেজিতে regiment, adminstration ও conduct শব্দগুলোও ব্যবহৃত হয়।

প্রচলিত 'সুশাসন' ধারণাটি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক উদ্ভাবিত। একটি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বব্যাংক সর্বপ্রথম উন্নয়নের প্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে সুশাসন ধারণাটিতে গুরুত্বারোপ করে।

'সুশাসন' প্রত্যয়টিকে কোন একটি নির্দিষ্ট ধারণার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায় না। এটি একটি বহুমাত্রিক ধারণা। বিভিন্ন তাত্ত্বিক এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো সুশাসন ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করেছে। সুশাসন সম্পর্কে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য একটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ম্যাককরনি। তিনি বলেন,

> Good governance is the relationship between civil society and the state, between government and governed, the ruler and ruled. "সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের এবং শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বোঝায়।" (Haque 2013, 10)

মারটিন মিনোগের মতে,

> "বৃহৎ অর্থে সুশাসন হচ্ছে কতিপয় উদ্যোগের সমাহার ও একটি সংস্কার কৌশল, যা সরকারকে আরো বেশি গণতান্ত্রিক, মুক্তমনা, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য সুশীল সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় করে তোলে।" (Haque 2013, 9)

বিশ্বব্যাংক সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদানে বলেছে,

> Good governance is the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development. "সুশাসন হলো উন্নয়নের জন্য কোন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবহারযোগ্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতার প্রয়োগ কৌশল।" (IPA Government 1999, 1)

পশ্চিমা সুশাসন তত্ত্ব

প্রচলিত 'সুশাসন' একটি পশ্চিমা দর্শন। গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে দাতা সংস্থাগুলো উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে ঋণদানের ক্ষেত্রে সুশাসনের প্রতি গুরুত্বারোপ করছে।

> "জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক ভূতপূর্ব কমিশন ইউএনসিএইচআরের ২০০০/৬৪ নম্বর প্রস্তাবে সুশাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলো স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহি, অংশগ্রহণ ও জনগণের চাহিদার প্রতি সাড়া প্রদান। এ প্রস্তাবে সুশাসনকে টেকসই মানব উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। মানবাধিকার ভোগ করা এবং টেকসই মানব উন্নয়নের সহায়ক একটি অনুকূল পরিবেশের সঙ্গে সুশাসনকে স্পষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। এতে আরো উল্লেখ রয়েছে- সুশাসন ও মানবাধিকারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে চারটি ক্ষেত্রে- গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো, রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণকে সেবা প্রদান, আইনের শাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ।" (Khokon 2016, 7)

সুশাসনের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য

সুশাসন তত্ত্ব প্রচলনকারী সংস্থাগুলো এবং বিভিন্ন লেখক ও গবেষক সুশাসনের বিভিন্ন উপাদান ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। G. Bilney, OCED ও UNDP সুশাসনের যেসব উপাদান ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন, তা হলো-

১. অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া
২. নৈতিক মূল্যবোধ
৩. স্বচ্ছতা
৪. বৈধতা
৫. দায়িত্বশীলতা
৬. আইনের শাসন
৭. দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহি
৮. দক্ষতা
৯. জনপ্রশাসনের সেবাধর্মী মনোভাব
১০. স্বাধীন বিচার বিভাগ
১১. সততা
১২. লিঙ্গ বৈষম্যের অনুপস্থিতি
১৩. বিকেন্দ্রীকরণ
১৪. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা
১৫. সুশীল সমাজ
১৬. জন গ্রহণযোগ্যতা
১৭. পৈশাদারিত্ব
১৮. মর্যাদা ও বিশ্বাস অর্জন

১৯. প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা
২০. মুক্ত এবং বহুত্বভিত্তিক সমাজ (Haque 2013, 10-12)

টেকসই উন্নয়ন পরিচিতি

সাধারণ অর্থে টেকসই উন্নয়ন হলো চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম- যা ভবিষ্যতের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে না। টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে Sustainable Development Commission বলেছে,

> Sustainable development is development that meets the needs of the present, without compromising the ability of future generations to meet their own needs. টেকসই উন্নয়ন হলো এমন উন্নয়ন যা বর্তমানের চাহিদা পূরণ করে; কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা পূরণের সক্ষমতাকে এড়িয়ে যায় না। (sd-commission.org.uk 2020)

এছাড়া মোঃ রায়হানুল ইকবাল ইভান বলেন,

> টেকসই উন্নয়ন বলতে ঐ ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে বোঝায় যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাও নিশ্চিত হয় আবার প্রকৃতি এবং বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেমেও কোনো বাজে প্রভাব পড়ে না। ভিন্নভাবে বললে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হলো ভবিষ্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা।" (Dhaka Tribune, June 2, 2019)

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ

২০০১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' বাস্তবায়নের পর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ২০১৬-২০৩০ মেয়াদের জন্য 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' গৃহীত হয়। এর আনুষ্ঠানিক নাম ছিল- Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development। এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা, ১৬৯টি লক্ষ্য ও ২৩২টি সূচক নির্ধারিত হয়।

(United Nations 2020)

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নিম্নরূপ-

১. দারিদ্র্য বিমোচন... সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্য নির্মূল করা।
২. ক্ষুধা মুক্তি... ক্ষুধা মুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টির লক্ষ্য অর্জন ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা চালু।
৩. সুস্বাস্থ্য... স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করা ও সব বয়সের সবার কল্যাণে কাজ করা।
৪. মানসম্মত শিক্ষা... অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা।
৫. লিঙ্গ সমতা... লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সব নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়ন করা।
৬. সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা... সবার জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের সহজপ্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
৭. নবায়নযোগ্য ও ব্যয়সাধ্য জ্বালানী... সবার জন্য ব্যয়সাধ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানী সুবিধা নিশ্চিত করা।
৮. কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি... সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল ও উপযুক্ত কাজের সুবিধা নিশ্চিত করা।
৯. উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো... দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো তৈরি করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন করা এবং উদ্ভাবন উৎসাহিত করা।
১০. বৈষম্য হ্রাস... দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈষম্য হ্রাস করা।
১১. টেকসই নগর ও সম্প্রদায়... নগর ও মানব বসতিগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করে তোলা।
১২. সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার... টেকসই ভোগ ও উৎপাদন রীতি নিশ্চিত করা।
১৩. জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ... জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
১৪. টেকসই মহাসাগর... টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সেগুলোর টেকসই ব্যবহার করা।
১৫. ভূমির টেকসই ব্যবহার... পৃথিবীর ইকোসিস্টেমের সুরক্ষা, পুনর্বহাল ও টেকসই ব্যবহার করা, টেকসইভাবে বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ রোধ, ভূমিক্ষয় রোধ ও বন্ধ করা এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি রোধ করা।
১৬. শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান... টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরি করা, সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ প্রদান করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব ... বাস্তবায়নের উপায়গুলো জোরদার করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনর্জীবিত করা। (Wikipedia 2020)

টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন

টেকসই উন্নয়ন অর্জনে সুশাসন প্রথম সোপান স্বরূপ। সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন ব্যতিরেকে টেকসই উন্নয়নের কোন লক্ষ্য, কৌশল বা পদ্ধতি সর্বজনীনভাবে কার্যকর হতে পারে না। সুশাসনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় বলা হয়েছে,

> সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমন ব্যতিরেকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০১৬ অভীষ্ট অর্জন সম্ভব নয়। আর দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আইনের চোখে সকলেই সমান এই বিবেচনার পাশাপাশি রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকতে হবে এবং এই সদিচ্ছার বাস্তবায়ন করতে হবে, কেননা রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। (Daily Janakantha, Aug.10, 2017)

উন্নয়নকে সর্বজনীন করতে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে ন্যায়বিচারকে উন্মুক্ত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কার্যকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। টেকসই সমাজ বিনির্মাণে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন উল্লেখ করে পলিন ট্যামেসিস বলেন,

> এসডিজির প্রস্তাবিত লক্ষ্যসমূহ আগামী দেড় দশক ধরে টেকসই ও সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে সমাজ গড়ার প্রয়াসকে আরও সহায়তা করার স্তম্ভ নির্মাণ করে। আর এই স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এসডিজি ১৬। এসডিজি ১৬-এর অগ্রগতি অপর সব এসডিজি লক্ষ্যকে জবাবদিহিমূলক ও কার্যকর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্মুখে চালিত করার একটি সুযোগ। আর সবার সুবিচার পাওয়ার অধিকার শান্তিপূর্ণ ও অংশীদারমূলক সমাজের মূল ভিত্তি। যেসব লক্ষ্য গৃহীত হতে যাচ্ছে তার সব কটি বাস্তবায়নে যে প্রচেষ্টা প্রয়োজন, তার চাবিকাঠি হচ্ছে দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিত্বমূলক সিদ্ধান্তগ্রহণের একটি পরিবেশে উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা।" (Pauline 2015, 8)

ইসলামে সুশাসন তত্ত্ব

মহান আল্লাহ বলেন

> ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾
>
> তোমরা অনুসরণ করো, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। তোমরা তো অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। (Al-Qurān, 7:3)

কাঙ্ক্ষিত সমাজ বিনির্মাণে ইসলাম সবসময়ই সুশাসনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলাম কেবলই কোন ধর্ম-দর্শন নয়; বরং সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলারও দর্শন। যেহেতু ইসলাম তার অনুসারীদের বিশ্বাস করায় যে, একদিন তাকে স্রষ্টার সামনে তার সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে, তাই একজন প্রকৃত মুসলিমের যাবতীয় আচরণই ইসলামী সুশাসনের চাদরে আবৃত থাকে। ইসলামে সুশাসনের ধারণা কেবল গুটিকয়েক

সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানবকল্যাণের প্রয়োজনীয় সকল উপাদানই এর অন্তর্ভূক্ত।

১৪০০ বছরেরও বেশি সময় আগে বিদায় হজ্জে জাবালে রহমতে রাসূলে কারিম ﷺ কর্তৃক ভাষণ দেবার পরে যখন ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ ঘোষণা করা হলো, তারপর থেকে ধর্ম হিসেবে ইসলাম কাল ক্রমে আরও সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে। ইসলামের আগমন যেহেতু কেবলই ধর্ম হিসেবে নয়, তাই এতে মানবজীবনের সকল প্রয়োজন ও অনুশাসন সম্পর্কে পূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে রাসূলে কারিম ﷺ মদীনায় এসে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন এবং সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সর্বোচ্চ মেলবন্ধন নিশ্চিতকরণে পৃথিবীর প্রথম লিখিত সনদ প্রণয়ন করলেন। তাঁর দশ বছর ও তৎপরবর্তী খোলাফায়ে রাশিদিনের ত্রিশ বছরের শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামী সুশাসনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এ সময়কালে শাসনব্যবস্থার যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তা যেকোন ধর্ম ও জাতির জন্য আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সুশাসন বলতে যে মানবকল্যাণের নিশ্চয়তা ও অনুশাসনকে নির্দেশ করা হয়, ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, এটি কেবল রাসূলে কারিম ﷺ ও তৎপরবর্তী খেলাফত ব্যবস্থায় বিদ্যমান ছিল। আমরা জানি যে, দুর্নীতি মানবচরিত্রের সহজাত প্রবৃত্তি। সমাজকে সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতিমুক্ত করতে কেবল জাগতিক আইন যথেষ্ট নয়। এটি কেবল ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই সম্ভব। পরকালে জবাবদিহির ভয় মানুষকে কেবল আইন মানতেই বাধ্য করে না, বরং তাকে আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাঙ্ক্ষিত সমাজ বিনির্মাণে অবদান রাখতে প্রেরণা যোগায়।

একজন মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীতে যাবতীয় শাসন ব্যবস্থার একমাত্র অনুশাসনদাতা আল্লাহ। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে,

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾

সকল বিধান দেবার ক্ষমতা কেবলই আল্লাহর। (Al-Qurān, 12:40)

একজন মুমিন ও মুসলিম যখন শাসনকার্য পরিচালনা করেন, তখন সে কার্যে তিনি তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে পারেন না। *সুশাসনের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য* পয়েন্টে যে **আইনের শাসনের** কথা উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ের প্রতি দিকনির্দেশ করে বলেন,

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

তারা কি মূর্খতার যুগের অনুশাসন কামনা করে? বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম অনুশাসনদাতা কে? (Al-Qurān, 5:50)

এ আয়াতে এটি সুস্পষ্ট যে, আইনের শাসন প্রশ্নে আল্লাহর বিধানই যথেষ্ট। এছাড়া ইসলামী সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাসূলে কারিম ﷺ এর নির্দেশনাও অগণিত। তিনি কেবল

শাসনকার্য পরিচালনা করেই তার বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ করেননি, বরং সময়ে সময়ে তিনি মৌখিকভাবেও বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আদর্শ শাসকের জনগ্রহণযোগ্যতা, মর্যাদা ও বিশ্বাস অর্জন গুণ বর্ণনায় তিনি ইরশাদ করেছেন,

خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ " لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ "-

তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারাই, যাদেরকে তোমরা ভালোবাস আর তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে। তারা তোমাদের জন্য দুআ করে, তোমরাও তাদের জন্য দুআ কর। আর তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারাই, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর, আর তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও, আর তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি তারেদকে তরবারি দ্বারা প্রতিহত করব না? তখন তিনি বললেন, না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম রাখবে। আর যখন তোমাদের শাসকদের মধ্যে কোনরূপ অপছন্দনীয় কাজ প্রত্যক্ষ করবে, তখন তোমরা তাদের সে কাজকে ঘৃণা করবে কিন্তু তাদের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না। (Muslim 2003, 4651)

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সবার জন্য ন্যায়বিচার একটি অপরিহার্য উপাদান। বিচারব্যবস্থায় যে সমাজে সাম্য নেই, সে সমাজে প্রকৃত সুশাসন সুদূর পরাহত। পেশাদারিত্ব ও স্বাধীন বিচার বিভাগের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে অপর বর্ণনায় রাসূলে কারিম ﷺ বলেন,

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا-

ন্যায় বিচারকগণ (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর নিকটে নুরের মিম্বরসমূহে মহিমান্বিত দয়ালু (আল্লাহ্) এর ডানপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকবেন। আর উভয় হাতই ডান হাত (অর্থাৎ সমান মহিমান্বিত)। সেই ন্যায়পরায়ণ হচ্ছে ঐ সব লোক, যারা তাদের শাসনকার্যে তাদের পরিবার পরিজনের ব্যাপারে এবং তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে সুবিচার করে। (Muslim 2003, 4570)

প্রচলিত শাসনব্যবস্থায় একজন শাসক নির্বাচিত হবার আগে রাজনৈতিক প্রচারণা করতে গিয়ে জনগণকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখান এবং নামসর্বস্ব প্রতিজ্ঞা করেন। তাদের চাকচিক্যময় ইশতিহারে জনসাধারণ মাঝেমাঝেই বিভ্রান্ত হন এবং তাদের নির্বাচিত করেন। দিনশেষে নির্বাচিত হয়ে তারা তাদের দেওয়া প্রতিজ্ঞাসমূহ বেমালুম ভুলে যান। ফলে এসকল জনপ্রতিনিধি কর্তৃক সমাজে কেবল নৈরাজ্যই বেড়ে চলে। সুশাসনপূর্ণ কাঙ্ক্ষিত সমাজ বিনির্মাণে তাদের কোন অবদানই থাকে না। বিচারব্যবস্থা আরও ভেঙে পড়ে।

ইসলামী শাসনব্যবস্থায় সকল বিধানের উৎস হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহ অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করে। এ শাসনব্যবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নিয়ত বর্তমান থাকে। একজন আদর্শ শাসক কখনো কুরআন-সুন্নাহের অনুসরণ আবার কখনো নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যারা এমনটি করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কেয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। (Al-Qurān, 2:85)

এজন্য ইসলামী শাসনব্যবস্থার সকল বিধানের উৎসই কুরআন ও সুন্নাহ। নিজ স্বার্থে কিংবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে মুসলিম শাসকগণ কখনো আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করেন না। আল্লাহকে সকল বিধানদাতা ঘোষণা দিয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾

আপনি বলুন, যাবতীয় বিধান কেবলই আল্লাহর পক্ষ থেকে। (Al-Qurān, 3:154)

সুশাসনকে ইসলাম কেবল 'শাসনব্যবস্থা' হিসেবে সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ করেনি। বরং মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ও বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কেবল শাসকই নয়, সকল উম্মাহকে দায়িত্ববান ঘোষণা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে,

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায়কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। (Al-Qurān, 3:110)

উল্লিখিত আয়াতে আমরা সুশীল সমাজের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের ধারণা পাই।
নামমাত্র কোন তত্ত্ব দিয়েই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় একজন শাসক প্রকৃত অর্থেই অনুসরণীয় হবেন। এমন আদর্শবান শাসকের আনুগত্যও ইসলামে আবশ্যক ঘোষণা করা হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়েবিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে সে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর-যদি

তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (Al-Qurān, 4:59)

এ আয়াত অধ্যয়নে আমরা জানতে পারি, এ শাসনব্যবস্থায় শাসক মুসলিমদের অনুসরণীয় গুণে গুণান্বিত হবেন। ন্যায়নিষ্ঠও পাপাচারমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় এ ধরনের পবিত্র আহ্বান আর কোন শাসনব্যবস্থায় চোখে পড়ে না।

জনপ্রশাসনের সেবাধর্মী মনোভাব নিশ্চিতকরণ ও সুশীল সমাজ বিনির্মাণে নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে কারিমায়,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখো। (Al-Qurān, 16:90)

প্রচলিত সুশাসনের প্রথম উপাদান অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার গুরুত্বারোপ করে বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾

যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে, পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। (Al-Qurān, 42:38)

সুশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান জবাবদিহির তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে এ আয়াতে কারিমায়,

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ -عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে। (Al-Qurān, 15:92-93)

সামগ্রিক সুশাসন সম্পর্কিত সবচেয়ে সুস্পষ্ট বিধান বর্ণনায় রাব্বে কারিম বলেন,

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾

পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও পরিশুদ্ধ করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি কর না। তাঁকে আহবান কর ভয়ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। (Al-Qurān, 7:56)

কুরআন ও সুন্নাহের এসকল নির্দেশনা অধ্যয়ন করে আমরা সহজেই ইসলামী সুশাসনের আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতা অনুধাবন করতে পারি। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সংস্থা বর্তমানে যেসব কৌশলপত্র উপস্থাপন করছে, ইসলামে সে সম্পর্কিত নির্দেশনাসমূহ ১৪০০ বছর আগেই সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামী আইন ও অনুশাসনের সামগ্রিক কল্যাণ পর্যবেক্ষণ করে বাংলাদেশের প্রখ্যাত মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আবুল ফাতাহ মুহাঃ ইয়াহইয়া ইসলামী আইনের বেশকিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো-

১. ইসলামী আইন সকল প্রকার জুলুম, নির্যাতন, পক্ষপাতিত্ব ও বাড়াবাড়ি মুক্ত।
২. ইসলামী আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে আত্মিকভাবেও পরিশুদ্ধ করে।
৩. এ আইনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইন মেনে চলার অনুপ্রেরণাদায়ক শক্তি বিদ্যমান রয়েছে।
৪. ইসলামী আইন সর্বজনীন ও সর্বকালীন।
৫. এ আইন মানুষের জাগতিক সফলতার সর্বোচ্চ পন্থা নির্দেশ করে। পাশাপাশি মানুষের নৈতিক মানকেও উন্নত করে। (Yeahya 2019, 443)

নৈতিকতা ও মূল্যবোধ পরিচিতি

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পশ্চিমা দেশ ও তাদের সংস্থাগুলো ধর্মীয় শিক্ষাকে উপেক্ষা করলেও কখনো কখনো তারা নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কথা বলে থাকে। নৈতিকতার আবেদন স্বীকার ও আইনের ব্যর্থতা উল্লেখ করে আর. এম. ম্যাকাইভার বলেছেন, "Law does not and cannot cover all grounds of morality." (Haque 2013, 61)

মূল্যবোধের সংজ্ঞায় এম. আর. উইলিয়াম বলেন, "মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড। এর আদর্শে মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই মানদণ্ডে সমাজে মানুষের কাজের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়।" (Haque 2013, 50)

মূল্যবোধ সম্পর্কে সবচেয়ে জনপ্রিয় সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এম. ডাব্লিউ. পামফ্রে। তার মতে, "মূল্যবোধ হচ্ছে ব্যক্তি বা সামাজিক দলের অভিপ্রেত ব্যবহারের সুবিন্যস্ত প্রকাশ।" (Haque 2013, 50)

রাজনীতি এবং সুশাসনের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ওপর গুরুত্বারোপ করে ফক্স বলেছেন, "ন্যায়নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে যা অন্যায়, তা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক বা ন্যায় হতে পারে না।" (Haque 2013, 18)

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উৎস

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উৎস নিয়ে তর্ক বহুদিনের। ধর্মই নৈতিকতার একমাত্র উৎস কিনা, তা নিয়ে অনেক গবেষণা ও লেখালেখি হয়েছে। পশ্চিমা চিন্তাবিদদের মতে আধুনিক সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বুদ্ধিবৃত্তি। এ বুদ্ধিবৃত্তি মূলত ব্যবহারিক জীবনের হাতিয়ার স্বরূপ। প্রচলিত এ বুদ্ধিবৃত্তি সমাজ গঠনে ঐশী বিধানের বিরোধিতা করে থাকে এবং ধর্মীয় নৈতিকতার আবেদন অস্বীকার করে মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলার চেষ্টা করে। সে হিসেবে আধুনিক সমাজজীবনে ধর্ম সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর হয়ে পড়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রকৃত বিচারে তৃতীয় সহস্রাব্দে আমরা ধর্মের লক্ষণীয় অগ্রগতির মুখোমুখি হচ্ছি।

প্রচলিত বুদ্ধিবৃত্তির মতবাদ কেবল মানুষের বস্তুগত চাহিদা পূরণ করছে। পাশাপাশি এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে মানুষের নৈতিক অবক্ষয়, অন্যায়-অনাচার, আত্মকেন্দ্রিকতা, মানবিক দায়িত্বহীনতা, ধ্বংসকামী উন্নয়ন ইত্যাদি আধুনিক মানুষকে নিরর্থক এক সত্তায় পরিণত করছে। তাই, বর্তমানে অনেক সমালোচক এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি ও মতবাদ মানুষের নৈতিক ও সামাজিক জীবনোপযোগী কাঠামো উপস্থাপনে অক্ষম।

সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্নতায় জাতিগত সংস্কৃতি ও সভ্যতা ভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণে আমরা দেখতে পাই যে, সর্বজনীন সকল ভালো ও মন্দের সংজ্ঞা ধর্ম থেকে উৎসারিত। বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবনের জন্য ধর্ম, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির আলোকে আমরা সমাজে প্রচলিত কিছু অপরাধ এবং কর্মকাণ্ডকে বিশ্লেষণ করতে পারি।

অপরাধ/কর্ম	*মন্দ বিচারের উৎস*	*অপরাধের প্রকৃতি*
চুরি	সকল ধর্ম	সর্বজনীন স্বীকৃত অপরাধ
ব্যভিচার	সকল ধর্ম	সর্বজনীন স্বীকৃত অপরাধ
বাল্যবিবাহ	পশ্চিমা সংস্কৃতি	স্বীকৃত অপরাধ নয়
বিধবাবিবাহ	হিন্দু আইন	স্বীকৃত অপরাধ নয়

এখন প্রচলিত বিশ্বাসে নির্ধারিত এ চারটি কর্মের বিশ্লেষণ যদি আমরা করি, তাহলে দেখতে পাই- যে চুরি করে, তার ব্যক্তিগত কোন ক্ষতি হয় না। বরং আর্থিক বিবেচনায় সে লাভবান হয়ে থাকে। অসংখ্য অকাট্য দলিল উপস্থাপন করা যাবে যে, চুরি করার কারণে একজন চোর ব্যক্তিগতভাবে কোন বিবেচনাতেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় না। কেবল আইন যে সকল ধরনের অপরাধ দমন করতে সক্ষম নয়, সে বিষয়ে আমরা পূর্বেই পশ্চিমা দার্শনিক আর. এম. ম্যাকাইভার এর স্বীকারোক্তি উল্লেখ করেছি। এমতাবস্থায়, ধর্ম কেবল ধর্মই এবং ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে উৎসারিত নৈতিকতাই পারে একজন মানুষকে প্রতিক্ষণ এ কর্মকাণ্ড থেকে বাঁচিয়ে রাখতে। চুরির সংজ্ঞা থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে এর বিপরীত প্রভাব বর্ণনায় যেহেতু ধর্মের উপস্থিতি রয়েছে, তাই সর্বজনীন অপরাধ হিসেবে এটি সকল সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ব্যভিচারের বিষয়টিও প্রায় কাছাকাছি। এটি সকল ধর্মমতে গর্হিত অপরাধ। তাই, একইসাথে এটি সকল সমাজেও স্বীকৃত অপরাধ হিসেবে পরিগণিত। *প্রচলিত সুশাসন প্রত্যয়ের ব্যর্থতা* পয়েন্টে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সুশাসন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠাকারী দেশসমূহ ব্যভিচারেও রয়েছে প্রথম সারিতে!

আমরা যদি এবার বাল্য ও বিধবাবিবাহের দিকে দৃষ্টি ফেরাই, তাহলে দেখতে পাব- প্রথমটির যাবতীয় তত্ত্ব পশ্চিমের দেশ থেকে আমদানিকৃত। সর্বজনীনভাবে

বাল্যবিবাহের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা একটি বিবেচনাহীন কাণ্ড বৈ কিছু নয়। এটির সংজ্ঞা নির্ধারণে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা দেবার সক্ষমতা, জলবায়ু ইত্যাদি বিষয়কে আরও বেশি সম্পৃক্ত করা আবশ্যক ছিল। প্রচলিত বাল্যবিবাহের সংজ্ঞায় যেহেতু ধর্মের সরব উপস্থিতি নেই, তাই এটি সকল মানুষ ও সমাজের কাছে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত নয়। এ কর্ম যারা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছেন, তারা কোন ধরনের অপরাধবোধে ভোগেন না। আবার এটিকে ঢালাওভাবে যদি আমরা অপরাধ স্বীকার করে নিই, তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকারী কোন রাষ্ট্র কি তাদের সুশাসন তত্ত্ব দিয়ে তাদের রাষ্ট্রে কিশোরীদের পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে পারছে!? বিধবাবিবাহ একটি নিকৃষ্ট কর্ম- এ ধারণাটি মূলত কোন ধর্ম থেকে প্রসবকৃত নয়; এসেছিল হিন্দু আইন থেকে। কিন্তু বিধবাবিবাহ যে একটি সামাজিক প্রয়োজন, তা তো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এ বিষয়ক আন্দোলন থেকেই আমরা বুঝতে পারি। ফলে ১৮৫৬ সালে উপমহাদেশে বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়।

সামগ্রিক আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মই হলো টেকসই নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সর্বজনীন, প্রথম ও প্রধান উৎস। মানুষ সৃষ্টির প্রথম থেকেই ধর্ম ছিল, তাই ধর্মই মানুষের ভেতর কোনটি ভালো- কোনটি মন্দ সে বোধ প্রথম জাগ্রত করেছে। কালক্রমে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের পথে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার উৎস হিসেবে অনেক কিছু স্বীকৃত হলেও ধর্মই ছিল মানুষের বোধ ও বোধোদয়ের সূচনাকারী উৎস।

সুশাসনের অন্তরায়সমূহ

সুশাসনের পথ মসৃণ নয়; কণ্টকাকীর্ণ। এ পথে রয়েছে বহু বাধা। যেমন- ধর্মহীনতা, ধর্মীয় শিক্ষার অভাব, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, সমাজের ভারসাম্যহীনতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সহিংসতা, জবাবদিহির অভাব, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি, বাক-স্বাধীনতায় হুমকি, রাজনীতিতে সামরিক ছায়া, দুর্বল আইন বিভাগ, বিচার বিভাগের পরাধীনতা, রাজনীতিতে জনঅংশগ্রহণের অভাব, সাংঘর্ষিক রাজনীতির প্রবণতা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অঙ্গীকারহীনতা, গণতান্ত্রিক চর্চায় অনাগ্রহ, আমলাতন্ত্রের অদক্ষতা, স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের সংকীর্ণ কর্মপরিধি, সুযোগ্য নেতৃত্বহীনতা, জনস্বার্থ ও জনকল্যাণ বাস্তবায়নে আন্তরিকতার ঘাটতি ইত্যাদি। উল্লিখিত যাবতীয় সমস্যা ও প্রকৃত সুশাসনের অভাব বিশেষ করে অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোকে ঠেলে দিয়েছে এক চরম বৈষম্যপূর্ণ ব্যবস্থার দিকে। বাংলাদেশও তার বিপরীত নয়। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো হলেও প্রকৃত সুশাসনের বাস্তবায়নে বাংলাদেশ এখনও অনেক পিছিয়ে।

প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক সুশাসনের যেসব অন্তরায় উল্লেখ করেছেন, তা হলো-

১. বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ
১. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব এবং সহিংসতা

২. জবাবদিহির অভাব
৩. আইনের শাসনের অভাব
৪. সরকারের অকার্যকারিতা
৫. দুর্নীতি নিয়ন্ত্রনে ব্যর্থতা
৬. রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব
৭. রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব এবং ব্যক্তিপূজা
৮. রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ
৯. স্বজনপ্রীতি
১০. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না থাকা
১১. জনঅংশগ্রহণের অভাব
১২. অকার্যকর জাতীয় সংসদ
১৩. দুর্বল আইন বিভাগ
১৪. আমলাতন্ত্রের অদক্ষতা
১৫. আমলাদের জবাবদিহির অভাব (Haque 2013, 39-41)

সুশাসন সম্পর্কে আমাদের দেশে সবচেয়ে সরব হলো টিআইবি নামক প্রতিষ্ঠান। এ সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা, নিবন্ধ, প্রবন্ধ তারা প্রকাশ করেছে এবং অসংখ্য গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক গবেষণায় তারা বলেছে,

> বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও বাংলাদেশে দুর্নীতি ও ঘুষ, অর্থপাচার, মৌলিক স্বাধীনতার ব্যত্যয় ও মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর নয় এবং এজন্য দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, নির্বাহী বিভাগ ও প্রশাসনের আধিপত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানেই জনগণের কাছে জবাবদিহির কোনো কাঠামো নেই এবং এসব প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি ব্যবস্থাও দুর্বল। (Transparency International Bangladesh (TIB) 2020)

প্রচলিত সুশাসন প্রত্যয়ের ব্যর্থতা

বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘসহ বিশ্বের প্রায় সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো অনুন্নত দেশসমূহে উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে কিছু কৌশলের কথা উল্লেখ করে থাকে। এর মাধ্যমে তারা যথাযথভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও অনুন্নত দেশগুলোতে প্রকৃত সুশাসন এখনো কল্পনাতীত। রাষ্ট্র, আইন প্রণেতা কিংবা কোন সংস্থা যখন সাধারণভাবে জনগণের জন্য কোন আইন প্রণয়ন করে এবং তার প্রয়োগে সচেষ্ট হয়, তখন ধর্মীয় এবং নৈতিক বাধ্যতার অনুপস্থিতি তার ফলাফল প্রদানে আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে দেয় না। ধর্মীয় অনুশাসন, নৈতিকতার অপরিহার্যতা প্রমাণ ও মূল্যবোধের উন্নয়ন ইত্যাদির অভাব বজায় রাখার কারণে গত তিন দশকে প্রচলিত

সুশাসন এবং তার গতানুগতিক বৈশিষ্ট্য অনুন্নত বিশ্বে কাঙ্ক্ষিত সমাজ বিনির্মাণে তেমন সুফল বয়ে আনতে পারেনি। সুশাসনকে আমরা যদি বৃহৎ অর্থে গ্রহণ করি, তাহলে দেখতে পাই যে, প্রচলিত সুশাসন তত্ত্বের প্রসবকারী পশ্চিমা দেশগুলোতেও ভারসাম্যপূর্ণ ও অশ্লীলতামুক্ত সমাজ নির্মাণ, সর্বস্তরে বৈষম্য বিলোপ, সর্বজনীন নৈতিক মূল্যবোধ ধারণ, সততা, মর্যাদা ও বিশ্বাস অর্জন এবং মুক্ত ও বহুত্বভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। সুশাসন বলতে কেবল শাসনব্যবস্থার উন্নতিই বোঝায় না; সামগ্রিক মানবকল্যাণের প্রতিটি উপাদানই এর অন্তর্ভুক্ত। এজন্য আমরা দেখতে পাই, জাগতিক দৃষ্টিতে পূর্ণ সুশাসন (!) প্রতিষ্ঠাকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র নারীর জন্য পৃথিবীর বিপদজনক দশটি দেশের একটি। (The Straits Times 2020)

সর্বোচ্চ ধর্ষণের হারে প্রথম দশটি দেশের তালিকায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স ও কানাডা। (Wonderslist 2020)

এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে বেশিরভাগ অপরাধ সম্পর্কে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয় না এবং বেশিরভাগ অভিযোগকৃত অপরাধ সমাধান করা হয় না। (Pew Research Center 2020)

সর্বোচ্চ বর্ণবাদের দশটি দেশের তালিকায়ও রয়েছে প্রচলিত সুশাসনে ভরপুর দেশ জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও ইতালি! (Watch Mojo 2020)

এ সকল সমীক্ষা আমাদের সামনে দিবালোকের ন্যায় যে সত্য ফুটিয়ে তোলে, তা হলো ধর্মীয় অনুশাসন, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি অপরিহার্য গুণাবলি অর্জন ব্যতিরেকে কোন জাগতিক নামসর্বস্ব কৌশলপত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টেকসই ভূমিকা রাখতে পারে না। ফ্রাঙ্ক বুকম্যান এ সত্যটিই বলেছেন ভিন্নভাবে, "পৃথিবীতে সবার প্রয়োজন মেটাবার জন্য যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে, কিন্তু সবার লোভ মেটাবার জন্য তা যথেষ্ট নয়।" (Md. Abu Nasar 2017)

অবাক হয়ে লক্ষ করি যে, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান গোলাম রহমানও উপরোক্ত সত্য অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং তিনি বলেন,

> অভাব অনটন নয়, নৈতিক অবক্ষয়ই দুর্নীতির মূল কারণ। দুর্নীতি প্রতিরোধে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, কোন ধর্মই দুর্নীতিকে সমর্থন করে না। তাই ধর্মীয় মূল্যবোধ দিয়ে দুর্নীতিকে প্রতিরোধ করতে হবে।" (BDNews24, May 03, 2011)

মোঃ তোফাজ্জল বিন আমিন তার নিবন্ধে বলেন,

> বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল। এটা কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু সে উন্নয়নের সুফল কি সব শ্রেণি-পেশার মানুষ পাচ্ছে? এই প্রশ্ন যে কেউ করতেই পারেন। কারণ একদিকে অতি ধনী হওয়া মানুষের সংখ্যা যেমন বাংলাদেশে বাড়ছে তেমনি বিশ্বের অধিক দরিদ্র মানুষগুলো যে পাঁচটি দেশে বসবাস করছে, সেই

> তালিকায়ও বাংলাদেশ আছে। সিপিডির এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে গত ছয় বছরে জিডিপি বাড়ার দিনগুলোয় সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ মানুষের আয় বেড়েছে ৩২ হাজার কোটি টাকা। আর সবেচেয়ে গরিব ৫ শতাংশ মানুষের আয় কমেছে ১০৫৮ টাকা।" (Bin Amin 2019)

উল্লিখিত তথ্য আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, পশ্চিমা সুশাসন তত্ত্ব বাস্তবায়নের নামে দেশ কতটা ভয়ঙ্কর বৈষম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাকওয়ার গুরুত্ব

প্রচলিত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ তত্ত্বকে আমরা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তাকওয়া শব্দ দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। একজন শাসক মুসলিম হিসেবে যখন রাব্বে কারিমের দরবারে জবাবদিহির পূর্ণ নৈতিকতা ধারণ করেন, তখন তার মাধ্যমে একটি সমাজ বা রাষ্ট্র তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে চলে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাকওয়া বা খোদাভীতির গুরুত্ব অপরিসীম। বিচার দিবসের কঠিন ও ভয়াবহ পরিস্থিতি খুব স্বাভাবিকভাবেই শাসককে নৈতিক পদস্খলন ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে রক্ষা করে। সে জানে, তার সকল কর্মকাণ্ড প্রতিনিয়ত লিপিবদ্ধ হচ্ছে এবং তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব তাকে দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾

আমি সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি। (Al-Qurān, 78:29)

বিচার দিবসের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়। প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে। তোমরা যা করতে, আজ তোমারদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে। আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে, আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম। (Al-Qurān, 45:28-29)

আরও ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে, তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে, হায়আফসোস, এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি-সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না। (Al-Qurān, 18:49)

কেয়ামতের দিন নিজেকেই নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হবে। সেদিন সকল সত্য উন্মোচিত হবে। পার্থিব জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজেরও সুনিপুণ হিসাব দিতে হবে। দিনটিতে মানুষের হাতে প্রদত্ত আমলনামা প্রত্যেকের জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড প্রকাশ করে দেবে। আল্লাহ বলেন,

﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾

পাঠ করো তুমি তোমার আমলনামা। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট। (Al-Qurān, 17:14)

তাই, পার্থিব জীবনের সকল গৌরব, বিভাজন, সম্মান ও অহঙ্কার কেবলই সাময়িক। বরং স্রষ্টার কাছে মর্যাদার মাপকাঠি তো শুধুই তাকওয়া। এ আয়াতে কারিমায় আল্লাহ সে ঘোষণাই দিয়েছেন,

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত যিনি সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন। (Al-Qurān, 49:13)

একজন মুমিন তার আমলের প্রতিদান ইহলৌকিক জীবনেই প্রত্যাশা করেন না। তার সকল কাজে পরিশুদ্ধতার উদ্দেশ্য থাকে স্রষ্টার সন্তুষ্টি এবং পারলৌকিক মুক্তি। এ শুদ্ধতা কেবল কর্মের নয়; বরং আত্মারও। কেবল জাগতিক সমৃদ্ধি কামনার ক্ষতি সম্পর্কে কুরআনুল কারিমে হতাশার বাণী উল্লেখিত হয়েছে,

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ - أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

যে ব্যক্তি পার্থিবজীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই হল সেসব লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছু নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল, সবই বরবাদ করেছে। আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল। (Al-Qurān, 11:15-16)

এমনিভাবে স্রষ্টার ভয় ও পারলৌকিক জীবনের মুক্তির প্রত্যাশা একজন ধর্মপরায়ণ মানুষকে পার্থিব স্বার্থোদ্ধারে দুর্নীতিপরায়ণ হতে বাধা দেয়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এমনকি শাসনকার্য পরিচালনা করতে গিয়েও সে ক্ষমতার অপব্যবহার করে না এবং নিজের জন্য কোন সুবিধা অবৈধভাবে অর্জন করতে গিয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নেয় না।

কার্যকর সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয়

সুশাসন সকল দেশে ও সকল সমাজে একটি বহুল কাঙ্ক্ষিত ও নিয়ত আরাধ্য বিষয়। এ কাঙ্ক্ষিত শাসনব্যবস্থা বাস্তবায়নে উন্নত দেশগুলো বিভিন্ন এজেন্ডা ও ব্যবস্থাপত্র

তৈরি করেছে। এ সকল দেশসমূহ উন্নয়নের কিছু সূচকে এগিয়ে থাকার কারণে কখনো কখনো উন্নয়নশীল দেশের আমরা মনে করি যে, তাদের প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র প্রয়োগে তারা নিজেরা সফল হয়েছে। কিন্তু আমরা এ প্রবন্ধেই দেখেছি যে, সুশাসনের সামগ্রিক অর্থ গ্রহণ করলে এ সকল দেশের সার্বিক পরিস্থিতি কেমন রূপ পরিগ্রহ করে। আমাদের দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি বেশ কিছু সুপারিশ করে বলেছে,

> সুপারিশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও সদস্যদের নিয়োগে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ নিশ্চিতকরণ; সংবিধানের ৭০ ধারা সংশোধন করে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সংসদ সদস্যদের নিজ দলের সিদ্ধান্তের বাইরে/বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া; অধস্তন আদালতের ওপর আইন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণমূলক ধারা বাতিলকরণ; সরকারি কর্মচারীদের স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, অধিকার ও দক্ষতা নিশ্চিতকরণে পাবলিক সার্ভিস আইন প্রণয়ন।"(Transparency International Bangladesh (TIB) 2020)

বর্তমানে ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ৫ কোটির বেশি রয়েছে ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী। ধীরে ধীরে তা কমতে থাকবে। তাই এ তরুণ জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করতে এখনই নৈতিকতায় কার্যকর বিনিয়োগ দরকার। কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের সুশাসন এবং ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করতে হবে। নিম্নে এ বিষয়ক কিছু প্রস্তাবনা পেশ করা হলো-

- ❖ দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সকল ধর্মের ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ করা।
- ❖ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক ধর্মীয় ক্লাস গ্রহণের ব্যবস্থা করা।
- ❖ শিক্ষার সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং পাঠ্যবইয়ে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের জীবনী সংযুক্ত করা।
- ❖ কেবল স্কুল-কলেজ নয়, মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকেও সরকারিকরণ করা।
- ❖ ধর্মভিত্তিক নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার প্রসারে শিশুদের উপযোগী কনটেন্ট তৈরিকরণে দিকনির্দেশনা প্রদান করা।
- ❖ দেশের সকল মসজিদ, মন্দির ও গীর্জার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সরকারি কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা প্রদান করা।
- ❖ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের কর্মকাণ্ড ও তার পরিধি আরও বিস্তৃত করা এবং সকল মসজিদের খতিব, ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ❖ দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- ❖ প্রকৃত ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে সুদমুক্ত অর্থনীতি চালু করা।
- ❖ পুঁজিবাদি অর্থনীতির বিস্তার রোধ করে ইসলামী অনুশাসনের আলোকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করা।

- ❖ দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাত ব্যবস্থার পূর্ণ তদারকি করা।
- ❖ স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা। রাসূলে কারিম ﷺ রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার ভিত্তিতে গোত্র প্রধানদেরকে স্থানীয় প্রশাসকের পদে নিয়োগ করেন। এ পন্থায়... তৃণমূল পর্যায়ে প্রশাসনকে সক্রিয় করা সহজ হয়েছিল।" (Yeahya 2019, 226)
- ❖ মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে সংসদে সংরক্ষিত আসনে আলেম সাংসদ নির্বাচনসহ আইন, বিচার ও শাসন বিভাগে আলেম ও ফকিহদের সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করা।

৮৯% মুসলিমের দেশে প্রজাতন্ত্রের সকল বিভাগে আলেমদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তাঁরা ইসলামী আইন ও অনুশাসন বিষয়ে বিভাগসমূহকে মজলিসে শুরার সদস্য হিসেবে পরামর্শপ্রদান করবেন। মজলিসে শুরার সদস্যদের যোগ্যতা সম্পর্কে ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস রাহ. মনে করেন যে, তাদের আলেম ও ফকিহ হওয়া উচিত। (Yeahya 2019, 360)

- ❖ জনগণকে ভোগান্তিহীন সেবাপ্রদান ও ঘুষমুক্ত কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠায় সার্বক্ষণিক মনিটর সেল স্থাপন করা এবং তার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আলেমদেরকে নিয়োগ দেওয়া।
- ❖ যত দ্রুত সম্ভব তামাক, মাদক ও নেশাজাতীয় সকল পণ্যের ব্যবহার নির্মূল করা।
- ❖ ধর্মীয় উগ্রবাদ সম্পর্কে সঠিক মেসেজ গণমানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
- ❖ ধর্মীয় যেকোন ধরনের সভা, মাহফিল, বৈঠক এবং আয়োজনকে স্বাগতম জানানো এবং এসবের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।
- ❖ পরিবার ও সমাজ ভাঙানিয়া সংস্কৃতির প্রসার বন্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ❖ দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করা।
- ❖ ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় উৎসবমুখর পরিবেশে নিয়মিত কার্যকর নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।
- ❖ প্রচলিত বাল্যবিবাহের সংজ্ঞা পরিবর্তনপূর্বক দেশ, নৈতিকতা ও জলবায়ু পরিস্থিতি বিবেচনা করে আরও বেশি জীবনমুখী ও বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

উপসংহার

স্বাধীনতার পর শূন্য হাতে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু। এক কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসন, সাত কোটি মানুষের খাদ্য সংস্থান, বিশাল সংখ্যক মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সে সময়ে জাতির জন্য ছিল প্রথম চ্যালেঞ্জ। অথচ রাজকোষ ছিল একবারেই শূন্য। সে অবস্থা থেকে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সাফল্য আসতে শুরু করেছে। কিন্তু জাগতিক বিবেচনাপ্রসূত এ সাফল্য অর্জন করতে গিয়ে প্রচলিত সুশাসন তত্ত্বের হাত ধরে দেশে সামগ্রিক দুর্নীতি ও বৈষম্যের কোন হ্রাস ঘটেনি। পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে

পড়ছে, বিবাহবিচ্ছেদের হার বাড়ছে, সামাজিক বন্ধন শিথিল হচ্ছে, অন্যায়-অনাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে, নারী নির্যাতন ও ব্যভিচার বেড়েই চলছে। আত্মকেন্দ্রিকতা, ঘৃণা ও বাস্তবিক জীবনে পারস্পরিক দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, মানবকল্যাণ এবং সামাজিক বন্ধনের আবেদন কমে যাচ্ছে । খোলা মন ও সম্প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গিতে উল্লিখিত যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি মানবজীবনের সকল কল্যাণে ধর্মের অবদান ও আবেদন। তাই, দেশ ও জাতির উন্নয়নকে টেকসই করতে আমাদের ইতিহাস থেকে রাসূলে কারিম ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের শাসনপদ্ধতি অবলোকন করতে হবে এবং তা থেকে ধর্ম, ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে টেকসই উন্নয়নের পথে দৃপ্ত কদমে এগিয়ে চলতে হবে।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Muslim, Abū al-Hussain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qushayrī. 2003. *Al-Musnad Al-Sahih*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Yeahya, Abul Fatah Muhammad. 2019. *Adhunik Rastrabiggan O Islam*. Dhaka: Biswa Kalyan Publication.

Haque, Professore Mohammad Mozammel. 2013. *Pauronity O Sushasan (1st Paper)*. Dhaka: Hasan Book House.

BDNews24. 2011. May 03, "Naitik Obokkhoy-e Durnitir Mul Karan". https://cutt.ly/SrVs4Kj

Daily Janakantha. 2017. Aug. 10, "Sushasan Pratistha O Durnity Daman Chara SDG Arzan Sambhab Noy". https://cutt.ly/XrX7fIx

Momen, Dr. A. K. Abdul. 2019. "Bangladesher Unnayan Agrozatra O Daridra Bimochan" *Kaler Kantho*, Dec. 11. Accessed Feb. 16, 2020. https://cutt.ly/8rVxgey

Ferdous, Hasan. 2016. "Sushasan O Unnayan" *Prothomalo*, Apr. 16. Accessed Feb. 16, 2020. https://cutt.ly/ErVcXpB

IPA Government. 1999. Accessed Feb. 16, 2020. https://cutt.ly/erVnEh5

Nasar, Md. Abu. 2017. "Durnitir Karan O Protikar" *Nayadiganta*, October 4. Accessed Feb. 16, 2020.https://cutt.ly/MrVam7R

Dhaka Tribune, June 2, 2019. "Teksai Unnayan Lakkhamatra Arzan O Bangladesh" *Bangla Tribune*, June 2. Accessed Feb. 16, 2020.https://cutt.ly/NrNrGCs

Bin Amin, Md. Tofazzal. 2019. "Eto Unnayan Tobu Sushasaner Abhab" *Dainik Sangram*, June 29. Accessed Feb. 15, 2020.https://cutt.ly/irX7wL9

Tamesis, Pauline. 2015. "Teksai Unnayan Lakkha 16" *Prothomalo*, Sept. 28. Accessed Feb. 15, 2020.https://cutt.ly/VrX6gZD

Pew Research Center. 2020. Accessed Feb. 16, https://cutt.ly/IrBmUD8

Khokon, Rezaul Karim. 2016. "Sushasan O Unnayan: Prekkhit Bangladesh" *Dainik Ittefaq*, Apr. 14. Accessed Feb. 16, 2020.https://cutt.ly/JrVmTFf

Sd-commission.org.uk. *Sustainable Development Commission*. 2020. Accessed Feb. 15, https://cutt.ly/ZrVVl7E

The Straits Times. 2020. Accessed Feb. 16, https://cutt.ly/DrBn0Ux

Transparency International Bangladesh (TIB). 2020. Accessed Feb. 15, 2020. https://cutt.ly/prCtugJ

United Nations. 2020. Accessed Feb. 15, https://cutt.ly/HrX7rFX

Watch Mojo. 2020. Accessed Feb. 16, https://cutt.ly/OrBmGJM

Wonderslist. 2020. Accessed Feb. 16, https://cutt.ly/rrBmcEH

Wikipedia. 2020. "Teksai Unnayan Lakkhamatra". Feb. 15, https://cutt.ly/OrX7rj4

OLD, Oxford Learner's Dictionaries. 2020. *governance.* Accessed June. 26. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/governance